অনীক

ভারতে বিপ্লবী পথ

বার্নার্ড ডি' মেলো

অনীক-এর সম্পাদকমণ্ডলী আমাকে বলেছেন সাম্য, পারস্পরিক সহযোগিতা, গোষ্ঠীগত ও মানব সংহতি অভিমুখে আমরা যাকে সঠিক পথ মনে করি, অর্থাৎ ভারতে সমাজতন্ত্রের অভিমুখের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে। সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম হবে দীর্ঘ, কঠিন ও হিংসাত্মক। বিশ্বজোড়া বিরোধী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ভারতে সমাজতন্ত্রের কথা অন্তত আমি কল্পনা করতে পারি না, যদিও সমাজতান্ত্রিক ভারত সমস্ত আন্তর্জাতিক হিসাবনিকাশকে পাল্টে দেবে। মনে করুন, মার্কস একবার বলেছিলেন যে আইরিশরা যদি বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, তবে ব্রিটেনে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে বেশি দিন লাগবে না। আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে চলে গেলে চলবে না। *অনীক* সম্পাদকমণ্ডলী যে প্রশ্নটি তুলেছেন সেটার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা দরকার। মাওবাদী পথ নিয়ে একটা প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ধারণা পরিষ্কার করে শুরু করা যাক। তারপর আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এগোনো যাবে। সমাজতন্ত্র আনার পথে নয়া গণতান্ত্রিক ভারতের জন্য সংগ্রামের সমর্থনে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঐক্য গড়ার জন্য মাওবাদীদের রণনীতি কী, তার বিভিন্ন দিক দেখা যাবে। আর তা করতে গিয়ে মানবজাতির কাছে মাওবাদের প্রতিশ্রুতির একটা দিককে পরিষ্কার করে দেখানো যাবে।

মাওবাদী পথ

আমি যতটা জানি ও বুঝি, তাতে সিপিআই (মাওবাদী)-র রাজনৈতিক ও সামরিক রণনীতি হলো দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, যেখানে সংগ্রামের *মুখ্য* ধরনটি হবে সশস্ত্র সংগ্রাম, সংগঠনের *প্রধান* ধরন হবে গণ ফৌজ (বর্তমানে গণ মুক্তি গেরিলা বাহিনী)। কিন্তু কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুব, নারী, বুদ্ধিজীবী ও জনগণের অন্য অংশের মধ্যে রাজনৈতিক কাজ ও গণসংগঠনও তাদের এজেন্ডায় আছে।

সবাই জানেন, যে সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)(পিপলস ওয়ার) মাওবাদী কমিউনিস্ট সেন্টার অফ ইন্ডিয়া-র (এমসিসিআই) সাথে মিলে ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সিপিআই (মাওবাদী) গঠন করেছিল, সেই সিপিআই (এম-এল)(পিপলস ওয়ার) রায়তু কুলি সংঘম (আরসিএস) ও র‍্যাডিক্যাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (আরএসইউ) নামে শক্তিশালী গণসংগঠন গড়ে তুলেছিল, কিন্তু ভয়ানক রাষ্ট্রীয় দমনের মুখে তাদের আত্মগোপন করতে হয়। সাধারণভাবে বিরাসম নামে পরিচিত রেভলিউশনারি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের কীরকম প্রভাব ছিল সেটাও হয়ত অনেকের মনে পড়বে, কিংবা মনে পড়বে অত্যন্ত জনপ্রিয় জন নাট্যমণ্ডলী-র কথা, যাদের পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট বলেই মনে করা হত। 'নকশালপন্থী মতাদর্শ প্রচারের' জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার তাদের ওপর দমনপীড়ন নামিয়ে আনে। প্রশ্ন হলো, ভয়ানক রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মুখে এই ধরনের গণসংগঠনের নেতা ও কর্মীদের জীবন বিপন্ন করে পার্টিটি এধরনের গণসংগঠন গড়ার কাজে সফল হতে পারে কি না। যাই হোক, এটা বলা যায় গেরিলা এলাকায় তারা এ ব্যাপারে বেশ এগোতে সক্ষম হয়েছে।[১] অরুন্ধতী রায় তাঁর প্রবন্ধ 'ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেড্স' (*আউটলুক*, ২৯ মার্চ, ২০১০)-এ যে ক্রান্তিকারী আদিবাসী মহিলা সংগঠনের কথা বলেছেন, তার কথা ধরা যেতে পারে।

যাই হোক, গণ সংগঠন যদি গোপন হতে বাধ্য হয়, 'সম্পূর্ণ গোপনীয়তা' বজায় রাখাটা যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে, গণ আন্দোলন কি তাতে শুকিয়ে যাবে না? মাওবাদীরা এটা ভালো করেই জানেন যে গ্রামীণ এলাকায় নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের ক্রমশ বেশি বেশি অংশের অংশগ্রহণ ও সমর্থন আদায় না করতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রণনীতি সফল হতে পারে না। এটাই হলো সেখানে 'ঘাঁটি এলাকা' প্রতিষ্ঠা, 'লাঙ্গল যার জমি তার' ভূমিসংস্কার করার ও অন্যান্য সামাজিক নীতি প্রয়োগ (যেগুলিকে পরিচালনা করা হবে গণতান্ত্রিকভাবে, ক্ষুদ্র আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্রের মতো করে) করা থেকে শুরু করে সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলে রাজনৈতিক গণসমর্থন গড়ে তুলে শহরগুলিকে ঘিরে ফেলা ও শহরাঞ্চলে জনসমর্থন গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ।

অন্যভাবে বললে, তারা এ বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন যে অস্ত্রের ওপর রাজনীতিকেই আধিপত্যের ভূমিকায় রাখতে হবে, পার্টির রাজনীতি কেমন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মাওবাদী রণনীতির একটা নিজস্ব যৌক্তিক কাঠামো আছে, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রাজনৈতিক দিকটার ওপর গুরুত্ব দিলে, তার মধ্যে হিংসাত্মক পথ (দুঃখজনক একটা প্রয়োজন) ও অ-হিংসাত্মক পথ, দুটিই পড়ে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ অহিংসাত্মক পথটি হলো গণ লাইন (জনগণ থেকে, জনগণের মধ্যে)।[২] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতীয় রাষ্ট্র এতদিন পর্যন্ত তাদের এই অ-হিংসাত্মক পথে কাজকর্ম বিকশিত করা থেকে বিরত রাখতে অনেকটাই সফল। বিপ্লবী সংগঠন, রণনীতি ও কাজকর্মের চিরায়ত মাওবাদী নীতি অনুসারে মুক্তির পথে সশস্ত্র সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তাকারী ভূমিকা আছে। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রের রণনীতিই আন্দোলনকে শুধু হিংসাত্মক আন্দোলনে পরিবর্তিত করেছে।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

এর পর আমি আসবো ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে। প্রথমেই আমি পাঠককে সতর্ক করে দিতে চাই যে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক , অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করার যৌথ প্রচেষ্টায় যুক্ত না হলে আমরা র‍্যাডিক্যালভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির গুরুত্বও বুঝতে পারব না। এখানে আমি আমার নিজের দুর্বলতার কথা বলছি। দ্বিতীয়ত, সিপিআই (মাওবাদী)-র নেতৃত্বে মধ্য ও পূর্ব ভারতের স্থানে স্থানে অতি-দরিদ্ররা ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছেন, কখনো কখনো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাঁরা হিংসাত্মক পথ নিয়েছেন। জীবন ও অঙ্গহানির দুঃখজনক সব ঘটনা সহ এই শ্রেণী সংগ্রাম প্রয়োজন ছিল কিনা সে কথা বিচার করার আমি কে? তৃতীয়ত, একজন সমাজতন্ত্রী হিসাবে আমি হিংসার পক্ষে নই, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় হিংসা হলো এক দুঃখজনক প্রয়োজন। সেই অবস্থাটা কী রকম?

যদি ''রাজনীতি হয় অর্থনীতির সবচেয়ে ঘনীভূত রূপ'', তাহলে প্রথমে আসা যাক অর্থনৈতিক অবস্থায়। ভারতবর্ষ একটি নির্ভরশীল ও পিছিয়ে থাকা পুঁজিবাদী দেশ, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিধিতে তার অবস্থান। এ দেশে শোষণের হার সবসময়েই ছিল খুব বেশি, এখনও তাই। শোষণ মানে শুধু শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পুঁজি আত্মসাৎ করা নয়। বিশাল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জমিদারদের হাতে, ব্যবসাদারদের ও সাহুকারদের (মহাজন) হাতে শোষিত হয়— প্রধানত গ্রামীণ এলাকায়, তবে শহরেও এটা চলে। শোষিত এই উদ্বৃত্তের 'বাণিজ্যীকরণ হয়, পুঁজিবাদী উদ্বৃত্ত মূল্যের সঙ্গে তা একেবারে মিশে যায়, আর আলাদা করা যায় না''— বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরিধি নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পল সুইজি বলেছেন। পাশাপাশি আমরা যোগ করতে পারি প্রকৃতি মায়ের সম্পদ ও সামাজিক সম্পদ লুণ্ঠনের কথা— ভারতে এখন যা ভয়ানক চালু।

এ সবের ফলে এদেশের আধিপত্যকারী শ্রেণীগুলি সুবিধা লাভ করে, মার্কিন দেশের আধিপত্যকারী শ্রেণীগুলির সমান মানে জীবনযাত্রা তাদের, ভোগও সেই মাত্রার। কিন্তু অন্যদের কী হবে— শ্রমিক, কৃষক, গ্রামাঞ্চলের ও শহরের বস্তিবাসী প্রান্তিক গরিব মানুষের? এরা বাধ্য হয় দারিদ্র্য, দুঃখ ও বঞ্চনার এক জীবন কাটাতে, কোনমতে টিকে থাকারও নিম্ন স্তরে বাঁচতে। ভারতের নির্ভরশীল, পিছিয়ে থাকা পুঁজিবাদের কাঠামোর মধ্যে প্রোথিত শোষণের এই উচ্চ হারের ফলে এদেশে গণ-ভোগ্যপণ্যের বাজার তৈরি হয়নি, এদেশ 'উন্নত' দেশ হতে পারে নি।

শোষণের এই উচ্চ হার বজায় রাখার জন্য দরকার হয় অত্যন্ত দমনমূলক একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। ভারতীয় সংবিধান ও ভারতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইংলন্ড থেকে নকল করা ফাঁপা কাঠামো মাত্র। তাহলেও এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক, কোন কোনও ক্ষেত্রে তা বিশেষ বিশেষ ধরনের শোষণ,নিপীড়ন ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তুলনায় সহজ করে তোলে।কিন্তু এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার খুব গভীরেই গন্ডগোল রয়েছে। আয় ও সম্পদের বন্টনে এত ভয়ানক অসাম্য থাকলে, জাতিগত, লিঙ্গগত ও ধর্মীয় এত পূর্ব-সংস্কার থাকলে, সে সমাজে গণতন্ত্র কীভাবে বিকশিত হবে? তাই দেখা যায় নিয়মিত ব্যবধানে আধিপত্য শ্রেণীগুলির পয়সায় চলা, তাদের অঙ্গ হয়ে পড়া কিছু লোককে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মনোনীত করার একটা ফাঁপা প্রক্রিয়া; আর তারপর পরের পাঁচ বছর ধরে ওরা দেশ চালাবে, রাজ্য চালাবে, মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েত চালাবে। আগের চেয়ে আরও বেশি করে আমরা এখন যা পাচ্ছি তা হলো বাজারের তৈরি, বাজারের জন্য, বাজারের সরকার। যারা জিনিসের দাম বোঝে, কিন্তু মূল্য বোঝে না। সে যাই হোক, সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্বগুলি থেকেই বেরিয়ে আসে রাজনীতি।

গত দুই দশক ধরে এদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র বিশ্বায়িত ব্যবস্থা দিয়ে ভরে গেছে। আধিপত্যকারী শ্রেণীগুলি ও তাদের প্রতিনিধিরা এখন দাবি করে যে, ওয়াশিংটনের সঙ্গে রণনীতিগত মৈত্রী জোরদার হওয়ার পর থেকে এ দেশ একটি অর্থনৈতিক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়ার পথে, যদিও ভারতের বাস্তবতা এই যে এ দেশকে বরং রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ উৎসা পট্টনায়েকের ভাষায় 'ক্ষুধার প্রজাতন্ত্র' নাম দেওয়া যায়। এদেশের নিঃস্ব জনসাধারণের দিকে তাকান, দেখুন তারা কী ভাবে বাঁচে। সে বাঁচাটা যেন 'বর্তমান সমাজের সমস্ত অমানবিক অবস্থার কেন্দ্র'। এই মানুষদের মধ্যে যেন 'মানুষটি হারিয়ে গেছে', কিন্তু আবার এদের মধ্যেই 'হারিয়ে যাওয়ার তাত্ত্বিক সচেতনতা খুঁজে পাওয়া গেছে, এই অমানবিক অবস্থার বিরদ্ধে (তারা) বিদ্রোহকে.. অপরিহার্য ও অবশ্যপ্রয়োজনীয় মনে করছেন।'' এ কথা মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন ১৮৪৪ সালে *হোলি ফ্যামিলি* গ্রন্থে। কথাগুলো পশ্চিম ইউরোপের তখনকার সর্বহারাদের নিয়ে। কিন্তু আজকে ভারতের বঞ্চিতদের সম্পর্কে এগুলি এত ভালো খাটে! ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একান্ত প্রয়োজনের ওপরও জোর দেয়। তাছাড়া, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও চীনে পুঁজিবাদের দিকে 'বিরাট পিছনের দিকে লাফ'-এর পর ভারতের দুর্দশাগ্রস্তদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। পুঁজিবাদ এখন তার মুখোশ খুলে ফেলেছে। পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ায় সবরকম নিষ্ঠুর পথ ধরতে তার আর কোনও বাধা নেই। এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী?

'সঠিক পথের' সন্ধানে

ভারতে সর্বজনীন ভোটাধিকার আছে। কিন্তু এদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা হলো একটা পচনশীল বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। একটা বিশাল কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রযন্ত্র, বেশ সশস্ত্র আধুনিক এক সেনাবাহিনী। কোনও কমিউনিস্ট পার্টি কি সংসদীয় নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করে এদেশে

ক্ষমতা দখল করতে পারে, সমাজতান্ত্রিক একটা সংবিধান আনতে পারে, আর এ কাজ করার পথে রাষ্ট্রের নিপীড়ক যন্ত্রকে প্রশমিত করতে পারে? এরকমটা করার চেষ্টা করার সময় সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত এই রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে শোষিতদের স্বার্থ দেখে এমন একটি রাষ্ট্রকে তার জায়গায় বসাতে পারে? আমার মনে হয় না যে ভারতের শাসক শ্রেণী সশস্ত্র প্রতিরোধ না করে কখনোই তাদের সম্পদ, তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না।

চিলির অভিজ্ঞতার (১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর) পর আমরা এ বিষয়ে আরও নিঃসন্দেহ হয়েছি। ১৯৭৯-এ নিকারাগুয়ার সান্দিনিস্তা বিপ্লবের অভিজ্ঞতাও তাই বলে। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে সান্দিনিস্তা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের ড্যানিয়েল অর্তেগা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতেছিলেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ষড়যন্ত্র ও বেনামে যুদ্ধ চালিয়ে গেল, ইরান-কন্ট্রার ঘটনা যার অন্তর্ভুক্ত। যাই হোক, সিপিআই(মাওবাদী)-দের দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের অঙ্গ হিসাবে বিকাশমান গণআন্দোলনের অধীনে রেখে তাদের বার্তাপ্রচারের জন্য সংসদকে ব্যবহার করা উচিত কিনা, এবং সংকটের সময় এটিকেই প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত কিনা, সেটা তাদের রাজনৈতিক লাইনের প্রশ্ন। সে বিষয়ে তাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য, তাও আবার অনাহূত উপদেশ, আমি বোধহয় সঠিক ব্যক্তি হবো না।

সিপিআই(মাওবাদী) পার্টিকে বেশি কালো করে চিত্রিত করার জন্য সিপিআই(মার্কসবাদী) বা সিপিএম পার্টির মুখপাত্ররা প্রায়ই লেনিনের *বামপন্থী কমিউনিজম: একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা* বইটি (১৯২০ সালের এপ্রিল-মে মাসে লেখা এই বইটি রাশিয়ার তিনটি বিপ্লবে বলশেভিক-দের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার সারসংকলন) থেকে উদ্ধৃতি দেন। কিন্তু সিপিএম-ই বরং সিপিআই-এর পদাংক অনুসরণ করে লেনিনের *রাষ্ট্র ও বিপ্লব*-এর (১৯১৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বরে লিখিত) বদলে এনেছে শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের অ-মার্কসীয়, অ-লেনিনীয় তত্ত্ব। সত্যিকারের লেনিনবাদী পার্টি তাদের সব ক্ষমতা, সব ইচ্ছাকে বিকশিত করবে বিপ্লবের জন্য। সত্যি বলতে কী, আমরা যদি অরুন্ধতী রায়ের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধটি বা গৌতম নওলাখার ‘ডেজ অ্যান্ড নাইট্‌স ইন দ্য হার্টল্যান্ড অফ রেবেলিয়ন’ পড়ি, দেখবো সিপিআই(মাওবাদী) সেই প্রচেষ্টাটা করছে। যেখানে যেখানে তারা পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে সেখানে সেখানে জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে তারা এটা করার চেষ্টা করছে।ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে কাজ করার প্রলোভন সংবরণ করে তারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার মনোবল সংগ্রহ করছে। শ্রেণীসংগ্রামকে সফল অভিমুখে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যা করার দরকার সেটা করছে। বিপরীতে, লেনিনীয় ভাবে সংগঠিত হলেও সিপিএম এখন ভারতের পিছিয়ে থাকা বুর্জোয়া সমাজ কর্তৃক অধিগৃহীত হয়ে গেছে, একটি সংস্কারপন্থী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পার্টিটির মধ্যে, এবং সিপিআই-এর মধ্যেও, এখনও অনেক ভালো লোক আছেন।

আগেই বলেছি, সিপিআই(মাওবাদী)-র হিসাব অনুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ একটি বিপ্লবী পথ, যেখানে সংগ্রামের মূল ধরন হবে সশস্ত্র সংগ্রাম, সংগঠনের প্রধান ধরন হবে গণফৌজ। নির্বাচন বয়কট নিয়ে এই পার্টিটির যে অবস্থান, তাতে তাদের যুক্তি এই যে নির্বাচনে অংশ নেওয়াটা জনযুদ্ধের সঙ্গে খাপ খায় না। পাশাপাশি, পার্টিটি গেরিলা এলাকায় জনগণের ক্ষমতার বিকল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের চেষ্টা করছে। কিন্তু তাদের দৃষ্টি কোণ থেকে সমস্যা এই যে এখনও পর্যন্ত তারা কোনো গেরিলা এলাকাকে ঘাঁটি এলাকায় পরিণত করতে পারে নি। ঘাঁটি এলাকা প্রতিষ্ঠা না করতেপারলে বর্তমানের গেরিলা যুদ্ধকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা গেরিল এলাকা আরও বাড়ানো অসম্ভব। সমতল এলাকাগুলি গেরিলা যুদ্ধ ও গেরিলা এলাকা প্রতিষ্ঠার জন্য তেমন সুবিধাজনক নয়। সমতল এলাকায় উচ্চতর গেরিলা ইউনিটগুলি তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারছে না, তারা জঙ্গল ও পাহাড়ে সরে গেছে। বর্তমানের গেরিলা এলাকার কয়েকটি জায়গা ঘাঁটি এলাকায় রূপান্তরযোগ্য, কিন্তু সেখানে ‘শত্রুকে’ পরাস্ত করতে হবে, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে।যে ভয়ানক নিপীড়ন চলছে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এগুলো করা বেশ কঠিন কাজ। মাওবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, তারা যদি কয়েকটি ঘাঁটি এলাকা গড়তে পারে ও সেগুলিকে টিকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ অনেক দিন টিকে থাকতে পারবে। ঘাঁটি এলাকা গড়তে না পারলে মাওবাদী গেরিলা বহিনী বেশিদিন টিকতে পারবে না, তারা বিকশিত হতে পারবে না। গেরিলা যুদ্ধের ভাষায়, ঘাঁটি এলাকাগুলি হলো পিছু হটে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা— রিয়ার। কিন্তু বলা দরকার যে গেরিলা এলাকার মধ্যে মাওবাদীরা কয়েকটি জায়গাকে নিজেদের এলাকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সেগুলিকে তারা বলে গেরিলা ঘাঁটি। পিছু হটার সময় আশ্রয় নেওয়ার জন্য এগুলিকে ‘পশ্চাদবর্তী ঘাঁটি’ হিসাবে খানিকটা ব্যবহার করা যায়।

আমাদের মধ্যে যারা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের সারাৎসারের সঙ্গে একমত নই, তারা অনেক সময় বুঝতে পারেন না যে গণফৌজ আর গণসংগঠন মিলে দীর্ঘদিন ধরে আগুপিছু করতে পারে। সশস্ত্র বাহিনী গঠন করার আগে গণ সংগঠন গড়লে তা যদি ব্যর্থ হয় তার বিপরীতটা চেষ্টা করা হবে; এমনকি সমতল ভূমিতেও গণসংগঠনের বিকাশের জন্য অসম যুদ্ধের উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। করে করেই তো পার্টি শেখে। প্রয়োগ, প্রয়োগে ভুল থেকে যৌথ শিক্ষাগ্রহণ, আবারও প্রয়োগ (আরেকটু বেশি সাফল্যের সঙ্গে)...,আবারও, বৃত্তাকারে প্রতিবার আর একটু করে এগোনো।

কিন্তু যে প্রশ্নটি করা দরকার তা হলো, আজকের ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কি অন্তত খানিকটা ১৯৩০-৪০ সালের চীনের মতো? নিঃসন্দেহে ভারতে কৃষক প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীগত পার্থক্য থেকে নিঃস্ব হওয়ার বদলে এখন তারা বাস্তুহারা হয়ে ও প্রতিবেশ গত অবনমনের কারণে নিঃস্ব হচ্ছে। নিচের দিকে, গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বহারা হয়ে পড়ছেন (ক্যাজুয়াল ও কনট্রাক্ট লেবার)। তাঁরা ক্ষুধার্ত, অপুষ্টির শিকার, গৃহহীন, ভূমিহীন, নিঃস্ব, আদিবাসী মানুষ, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত ইত্যাদি। এর ফলে কিছু দিনের মধ্যে শহুরে ও আধা-শহুরে জনসংখ্যা বাড়বে, আরও বেশি মানুষ এইরকম ‘নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত’ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন সব শ্রমিক যাদের পুঁজিবাদীদের সঙ্গে দরকষাকষির ক্ষমতা নেই। শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রে মজুরি-শ্রমিকের বাইরে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিশাল অংশ, যারা কোনমতে বেঁচে আছে।

সিপিআই(মাওবাদী)-কে এদের কথা খেয়াল রাখতে হবে। এর থেকে এই প্রশ্ন উঠে আসে— শহরের আন্দোলন কীভাবে শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী মৈত্রীর জন্য শ্রমিক কর্মী ও নেতার যোগাড় দেয়। শিল্প শ্রমিকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য মাওবাদীরা প্রায়ই সমালোচিত হয়। কিন্তু তারা যেখানে বেশ এগোতে পেরেছিল যেমন সিঙ্গারেনি কর্মিকা সমখ্যা সংগঠনের পতাকাতলে সিঙ্গারেনি কয়লাখনির শ্রমিকদের সংগঠিত করা, সেখানে ইউনিয়নটিকে নিষিদ্ধ করা হলো, নেতাদের আত্মগোপন করতে হলো। মাওবাদীরা কিন্তু শ্রমিকদের সংগঠিত করার বিশেষ গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন, কারণ রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে সচেতন করে তুললে সর্বহারারাই উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকী-করণের মূল্য বোঝেন, তাঁরা বোঝেন যে শ্রমিকরা যৌথভাবে অর্থনীতিকে চলচ্ছক্তিহীন করে দিতে পারেন, বিশেষত যদি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক অংশের শ্রমিকদের সংগঠিত করা যায়। তাঁরা বোঝেন যে যৌথভাবে তাঁরা শোষণের অবসান ঘটাতে পারেন।শহরাঞ্চলে সংগঠনের প্রশ্নে বলা যায়, সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকার মধ্যেকার ও কাছাকাছি অঞ্চলের শহরগুলিতে পার্টি কাজ করছে।

এখন, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ছাড়াও আছে 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ার প্রশ্ন, মাওবাদীদের চিন্তায় তথাকথিত চার শ্রেণীর জোট। কিন্তু চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতার পর, যেখানে অব্যাহত বিপ্লবের মাওবাদী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে (সঠিকভাবেই) কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পরই নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে দাঁড়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, তার পরে কি আর ভারতের বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অংশটি (যদি তা আদৌ থাকে) এই ধরনের বিপ্লবে যোগ দিতে চাইবে? যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি ও যাদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট তৈরি হবে তার মধ্যে বেশি বেশি সমাজতান্ত্রিক উপাদান যোগ করাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো হবে।

মাওবাদের প্রতিশ্রুতি

গণ সংগঠন ও গণফৌজের মিলনের প্রশ্ন থেকে শুরু করে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে মাওবাদীরা কেমন অনুশীলন করে, ভুল থেকে যৌথভাবে শিক্ষা নিয়ে আরো বেশি সাফল্যের সঙ্গে আবার অনুশীলনে যায়, এভাবে এই বৃত্তটি ক্রমশ বড় হতে থাকে, এবং এভাবে কাজ করার ও শিক্ষালাভ করার ক্ষমতাটা ভারতের জনগণের মধ্যে ও মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেয়— ভারতের ও অন্য সব দেশের র‍্যাডিক্যাল বামপন্থীরা সেটা লক্ষ্য করছেন, লক্ষ্য করবেন।

১. গেরিলা এলাকা, গেরিলা ঘাঁটি ও ঘাঁটি এলাকা বলতে কী বোঝানো হয়েছে তার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন: বার্নার্ড ডি' মেলো, 'স্প্রিং থান্ডার আনিউ: নিও-রবার ব্যারন ক্যাপিটালিজম ভার্সাস 'নিউ ডেমোক্রাসি' ইন ইন্ডিয়া,', *মান্থলি রিভিউ*, মার্চ ২০১০

২. গণ লাইন, অব্যাহত বিপ্লব ও অন্যান্য মাওবাদী শব্দের মাধ্যমে কী বোঝানো হচ্ছে তা পাওয়া যাবে: বার্নার্ড ডি' মেলো, *হোয়াট ইজ মাওইজম অ্যান্ড আদার এসেজ*, কর্নারস্টোন পাবলিকেশন, খড়গপুর, ২০১০